বিন্দু-রহস্য

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সকালবেলায় প্রিয়ব্রত এক কাপ চা খান। তারপর বাথরুম এবং মাঝে-মাঝে জানলায় চোখ— ঘড়িতে চোখ, সাতটা বাজে এখনও কাগজ দেওয়ার নাম নেই। কখন দেবে! এত দেরি করলে কাগজ পড়ে নিজের কাজে বসবেন কখন! তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। সোফায় বসে থাকেন— আগে বাজার করতেন, ইদানীং সাইটিকায় কষ্ট পাচ্ছেন বলে বাজারে যান না।

তখনই ডোর-বেল বাজল।

কে আবার এল!

দরজা খুলতেই দেখেন, অচেনা এক প্রৌঢ়া। তার সঙ্গে দশ-বারো বছরের একটি মেয়ে।

"মেসো, আপনার কাছে মণি পাঠাল।"

মণি এ-বাড়ির ঠিকে কাজ করে। মেয়েটির কাজে কামাই করার স্বভাব একটু বেশিমাত্রাতেই। মণি খুবই রোগা-পাতলা, মনে হয় ফুঁ দিলে বাতাসে উড়ে যাবে। তবে খুবই বিশ্বাসী। ওর অসুখবিসুখ লেগেই থাকে, দু'দিন আসেওনি।

প্রিয়ব্রত ভাবলেন, প্রৌঢ়াকে মণি হয়তো তার হয়ে কাজ করে দিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠিয়েছে। খুবই দুস্থ, দেখলেই বোঝা যায়।

তিনি দরজা থেকে সরে দাঁড়াতেই দশ-বারো বছরের বালিকাটি প্রায় লাফিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

"কিছু বলবে?"

"বিন্দুকে নিয়ে এলাম। আপনার লোকের দরকার— আমি মণির পাড়াতেই থাকি।"

সর্বক্ষণের একটি কাজের লোকের দরকার, মণিকে কথায়-কথায় বলে থাকতেও পারেন— কিন্তু এমন একটি গ্রাম্য বালিকার কথা তিনি কখনওই ভাবেননি। স্ত্রীর কতটা উপকারে আসবে, এটাও একটা প্রশ্ন।

"আমার নাম সেবাদাসী, মেসো। বিন্দু আমার ছোট বোনের মেয়ে। বড় ঘ্রাতান্তরে পড়ে গেছে। মা-বাবা কেউ নেই। কাকারা রাখতে চায় না। আমার কাছে চলে এসেছে। আমারও ক্ষমতা কতটুকু, কোথাও কাজে লাগিয়ে দিলে যদি ছিল্লে হয়। আপনি রাখুন, কোনও অসুবিধে হবে না।"

প্রিয়ব্রত বললেন, "একে দিয়ে হবে না। বাড়িতে মেলা কাজ, তোমার মাসিমার শরীরও ভাল না— বরং তুমি যদি বয়স্ক কারও খোঁজ দিতে পারো ভাল হয়। লোকের দরকার খুবই আছে, তবে একে রাখি কী করে!"

বিন্দু টুক করে পা ছুঁয়ে প্রণামও করে ফেলল।

প্রিয়ব্রত কিছুটা যেন ফাঁপরে পড়ে গেলেন। সঙ্গে ছোট্ট একটা পুঁটলিও আছে বিন্দুর। বোধ হয় যেখানে যায়, এই পুঁটলিটি তার সঙ্গেই থাকে। এমনভাবে তাকিয়ে আছে যে— তোকে দিয়ে হবে না—এমন বলতেও সঙ্কোচ বোধ করছিলেন।

বিন্দু যে ভারী চঞ্চল স্বভাবের এটাও কেন জানি মনে হল তাঁর। বিন্দু বাড়িঘর দরজা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। যেন এই বাড়ি তার খুবই চেনা, সে একবার ভেতরেও ঢুকে যেতে চাইল। কাজটা যেন তার হয়েই গেছে এমন নিশ্চিন্ত মনে সে উঁকি দিয়ে ভেতরের ডাইনিং স্পেসের দেওয়াল, দেওয়ালের হলুদ রঙের ক্যালেন্ডার এবং বাঁধানো প্রাকৃতিক দৃশ্যের কিছু ফোটো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে।

প্রিয়ব্রত কিছুটা বিরক্ত। সকালবেলায় অকারণ উৎপাত! 'একে রাখি কী করে' বলা সত্ত্বেও বাড়িটা সম্পর্কে বিন্দুর এত কৌতূহল তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না।

তিনি মুখের ওপর বলতেও পারছেন না, 'এখন যাও, পরে দেখা যাবে। দরকার হলে মণিকে দিয়ে খবর পাঠাব।' কোথায় যেন একটা ধন্দে তিনি পাক খাচ্ছিলেন, তখনই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, জয়ন্তী নেমে আসছে নীচে।

বিন্দু ভারী কাঁচুমাচু গলায় বলল, "আমি পারব। তুমি বাবু আমাকে রেখেই দ্যাখো না! আমি সব কাজ জানি।"

বিন্দুর মাসি একধাপ আরও এগিয়ে বলল, "গাঁয়ের মেয়ে, পরের বাড়িতে মানুষ দিনরাত কাজ করেও মুখ পেত না। এটুকুন পেট, তারই কত খোঁটা দিত সবাই! সব বাড়িতে দেওয়াও যায় না। উঠতি বয়স, আমিই মণিকে ধরেছিলাম।"

"সে তো বোঝলাম!"

তখন জয়ন্তী বসার ঘরে মুখ বাড়িয়ে বলল, "কার সঙ্গে কথা বলছ?"

"মণি পাঠিয়েছে। সবসময়ের কাজের লোকের দরকার, যদি বিন্দুকে দিয়ে হয়!"

"বিন্দুটা কে আবার?"

আসলে জয়ন্তী করিডর থেকে কথা বলছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রিয়ব্রত কার সঙ্গে কথা বলছে বুঝতে পারে না।

তিনি বললেন, "মণি পাঠিয়েছে বিন্দুকে।"

"মণি আসেনি!"

"না।"

"এত কামাই করলে চলে!"

তখনই বিন্দু ঘরে ঢুকে গেল। জয়ন্তীকে এক পলক দেখেই বলল, "আমি বিন্দু, আমি সব কাজ জানি। রেখেই দ্যাখো না!"

বিন্দু কথাবার্তায় বড়ই আন্তরিক। চোখ দুটো শীতের শিশিরের মতো চিকচিক করছে। কেন যে জয়ন্তী চোখের পলক ফেলতে পারল না, কী বলবে বুঝতেও পারল না। যা বয়েস, তাতে করে ওপর-নীচে সারাদিন কাজ সামলানো কঠিন। সবার এত বেশি ফুট ফরমাশ যে, একদণ্ড কারও বসে থাকার উপায় নেই।

তখনই অংশু ওপরে চেঁচামেচি করছে, "মা, আমার জিওমেট্রি বক্স পাচ্ছি না।"

"কোথায় রেখেছ দ্যাখো।"

"আমি দেখতে পারব না। তুমি দিয়ে যাও।"

বিন্দু বলল, "আমি দিয়ে আসব মা!"

জয়ন্তীর বুকটা কেমন ছাঁত করে উঠল। হেসে বলল, "তুই কোথায় পাবি! কোথায় কী রাখে, কিছুর কি ঠিক আছে?" বিন্দুর সরল অকপট মুখ দেখে জয়ন্তী কেন যে বলে ফেলল, "থাকুক কিছুদিন, যদি পারে থাকবে।"

প্রিয়ব্রত জানেন, সংসারে জয়ন্তীর পছন্দের ওপর আর কোনও কথা থাকতে পারে না। তিনি সেবাদাসীকে বসার ঘরে ডেকে বললেন, "টাকাপয়সা কী দিতে হবে, কাকে দিতে হবে। তা ছাড়া কত নেবে—"

"সে যা হয় দেবেন। থাকারই জায়গা পাচ্ছিল না! আপনি যে দয়া করে রাখতে রাজি হয়েছেন, কেউ বিন্দুকে রাখতেই চায় না।"

"রাখতে চাইবে না কেন, বিন্দুর কি খুব মেজাজ আছে!"

"আজ্ঞে না। সে মেজাজ করতেই জানে না! হাসিমুখে সব সামলে দেবে। তবে একটু চঞ্চল, কাজ না থাকলেও বসে থাকতে পারে না। নিজের মনে খেলা করে।"

প্রিয়ব্রত বললেন, "ছেলেমানুষ, কাঁহাতক চুপচাপ থাকতে পারে! ওর আর জামাকাপড় কিছু নেই? ছেঁড়া ফ্রকটা ছাড়তে গেলেই, যেটুকু আছে হাওয়া হয়ে যাবে।"

জয়ন্তী বলল, "সে না হয় কিনে দেওয়া যাবে।"

প্রিয়ব্রত বুঝলেন, গিন্নি বিন্দুর ওপর খুবই সদয়। সে হতেই পারে, এতটুকুন মেয়ে আসামাত্র সবাইকে সহজেই নিজের করে নিতে পারাও যে কঠিন কাজ।

আর তখনই জয়ন্তী হা হা করে ছুটে গেল।

"এই বিন্দু কোথায় যাচ্ছিস?"

"ওপরে।"

"কেন?"

"ভাইটি যে বসে আছে। জিওমেট্রি বক্সটা খুঁজে দিয়ে আসি।"

"সে হবে, আগে হাত-মুখ ধুয়ে নে। রাস্তার নোংরা পায়ে ওপরে উঠে যাচ্ছিস। তুই কী রে!"

"আমি যে বাথরুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে নিলাম। এই দ্যাখো না!" বলে সিঁড়ি থেকে নেমে এসে হাত মেলে দেখাল, ফ্রক তুলে পা বের করে দেখাল। সিঁড়ির মুখে লাইট জ্বালিয়ে রাখতে হয় সবসময়। নাহলে জায়গাটা দিনের বেলাতেও অন্ধকার থাকে। জয়ন্তী অবাক। সত্যি মেয়েটা হাত পা ধুয়েই ওপরে উঠতে যাচ্ছে। বাড়ির বাথরুম কোনদিকে, সেই বা জানল কী করে— শহরের বাড়িতে কাজ করলে অবশ্য বাথরুম চেনার খুব একটা অসুবিধে হওয়ার কথা না।

"আগে কোথায় কাজ করতিস?"

"কোথাও না।"

"তবে এখানেই নতুন কাজে ঢুকলি!"

"হ্যাঁ মা। মাসি তো আমাকে কম

জায়গায় ঢোকাবার চেষ্টা করেনি। আমি রাজি হইনি। আমার কাকারাও কম চেষ্টা করেনি, আমি রাজি হইনি। বাড়িটা দেখলেই বলতাম, 'না এ-বাড়ি না। এ-বাড়ি আমার সহ্য হবে না।'"

বিন্দুর এই পাকা-পাকা কথায় জয়ন্তী কেমন মজা পেল। বলল, "এ-বাড়িটা সহ্য হবে কী করে বুঝলি!"

"বাঃ রে, বাড়িটার সাদা রং যে আমার পছন্দ।"

জয়ন্তী এবার ধমকই দিল।

"থাম। পাকা বুড়ি। সাদা রং পছন্দ!"

বসার ঘর থেকে প্রিয়ব্রতও শুনতে পেলেন—'সাদা রঙ পছন্দ।' কতকাল আগেকার সেই প্রতিধ্বনি! মুখ কেমন তাঁর ব্যাজার হয়ে গেল। তিনি কেন যে উঠে গেলেন জানালায়! সামনে মাঠ, তারপর স্কুলবাড়ি, কিছু ঝাউগাছ স্কুলবাড়িটায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তার ওপর দিয়ে দিগন্তের আকাশ এক আশ্চর্য মহাশূন্যতা নিয়ে বিরাজ করছে টের পেলেন। কতকাল আগেকার দুটো-একটা ছবিও ফুলে উঠল।

তিনি তাঁর প্রবল দীর্ঘশ্বাস আড়াল করার জন্য সেবাদাসীকে বললেন, "ঠিক আছে, যাও। মাঝে-মাঝে এসে খবর নিয়ো। ছেলেমানুষ, কতদিন মন টেকে..." তারপর থেমে বললেন, "মণিকে দিয়ে দরকার হলে খবর পাঠাব। বিন্দুর জন্য চিন্তা করবে না। মনে হয় এখানে সে ভালই থাকবে।"

সেবাদাসী চলে গেল।

বিন্দু দোতলার করিডরে উঠে গেল। জয়ন্তী মেয়েটার সিঁড়ি ধরে ওঠার মুখে বলল, "এই লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙবি না। পা স্লিপ করলে কিন্তু তোকে আর আস্ত পাওয়া যাবে না।"

প্রিয়ব্রত ডাকলেন, "জয়ন্তী।"

"বলো।"

"করিডোরে দাঁড়িয়ে আছ কেন!"

"দেখছি।"

"কী দেখছ।"

জয়ন্তী কিছু আড়াল করার জন্যই বলল, "না, কিছু না।"

"কিছু নয় তো, দাঁড়িয়ে আছ কেন?"

জয়ন্তী আর পারল না।

"কিছু বলবে?"

"কাছে না এলে বলব কী করে?"

জয়ন্তী বসার ঘরে ঢুকেও বসল না। দাঁড়িয়ে থাকল।

"বিন্দুকে কেমন মনে হচ্ছে?"

"ভালই তো। খুব পাকা।"

"মাথায় কোনও গণ্ডগোল নেই তো!"

"গণ্ডগোলের কী দেখলে!"

"না, গণ্ডগোল না ঠিক," তারপরই কী বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। অতি তুচ্ছ অকারণ কিছু সংশয়ে পীড়িত না হওয়াই ভাল। তারপর নিজের মনেই বললেন, "বয়স হলে বোধ হয় এসব হয়।"

জয়ন্তী ছাড়ার পাত্র না।

"কী হয়?"

"বয়স হলে নানারকমের দুর্বলতা, বিন্দু ওপরে কী করছে, দ্যাখো না!"

জয়ন্তী আর দাঁড়াল না। সে ডাকছে, "বিন্দু, বিন্দু, ওপরে কী করছিস!"

বিন্দুর জবাব পাওয়া গেল না। অংশু চিৎকার করছে। "দ্যাখো মা, কোথাকার একটা মেয়ে ঢুকে গেছে। বলছে, ও বাড়ির কাজের মেয়ে। নাম বিন্দু। তোমরা নাকি তাকে কাজে ঢুকিয়েছ! আমাকে শাসন করছে। কোথায় ফেলে রাখো সঙ্গে রাখতে পারো না কেন ভাইটি! মাকে কেবল জ্বালাও। এই তো জিওমেট্রি বক্স, টেবিলের নীচের দিকের ড্রয়ারে।"

মহামুশকিল হল তো বিন্দুকে নিয়ে! জয়ন্তী বলল, "এই, এদিকে আয়। বাড়িতে ঢুকেই তোকে কাজ দেখাতে হবে না। আগে তোর বাবুকে, আমাকে চা করে দে। চা করতে পারিস তো!"

"দ্যাখোই না পারি কি না।"

বিন্দু সহজেই দু-কাপ চা ট্রেতে নিয়ে আসার সময় আলগা করে একটা প্লেটে চারটে বিস্কুটও নিয়ে এল। বলল, "বাবু তো খালি পেটে চা খায় না।"

জয়ন্তী যেন ফাঁপরে পড়ে গেছে।

"কথা একটু কম বলবি বিন্দু। কথার চোটে আমার যে মাথা ধরে যাচ্ছে। তুই কি মন্ত্র জানিস? চা, চিনি কোথায় তাও তো জিজ্ঞেস করলি না। ভাবলাম, আমি গিয়ে কোথায় কী আছে দেখিয়ে দেব—"

"চা কেমন হয়েছে আগে দ্যাখো। খেতে পারো কিনা দ্যাখো।"

জয়ন্তী বলল, "ভাল হয়েছে। এবারে যা। দরকার পড়লে ডাকব।"

বিন্দু চলে যেতেই জয়ন্তী বলল, "খুবই চটপটে, কপালে সইলে হয়!"

প্রিয়ব্রত কোনও কথা বলছেন না। চায়ে চিনি মেশাচ্ছেন। এবং খুবই যেন গম্ভীর হয়ে যাচ্ছেন।

বিন্দু, অংশুর ঘরে ঢুকে যেতেই ফের চেঁচামেচি, "এই, তুই এখানে কেন রে! তোরও সাহস কম না, আমি পড়ছি দেখছিস না। যা, বাইরে যা।"

জয়ন্তী সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে গেল। পরপর দুটো ঘর। ডান দিকের করিডর ধরে ঢুকলে আরও দুটো ঘর। দু'পাশে দুটো বাথরুম। দক্ষিণের ব্যালকনি-সংলগ্ন ঘরটি বন্ধই থাকে। এ ঘরের দরকার হয় না। একতলা তার দিয়ে ওপরে উঠে এলেও হয়! কিন্তু আজ দশ-বারো বছর ধরে তা আর হয়ে ওঠেনি। ভাড়া দেবে-দেবে করেও দেওয়া হচ্ছে না। একবার দোতলায় থাকতে গিয়ে প্রিয়ব্রত খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওপরে থাকতে তিনি খুবই অস্বস্তি বোধ করেন, এও জয়ন্তী জানে। একমাত্র অংশু আর তার কাকা সিঁড়ির ঠিক মুখের ঘরটায় থাকে। অংশুর কাকা অফিসের কাজে বাইরে গেলে গাড়ির ড্রাইভার রাতে অংশুর ঘরে খাটিয়া পেতে শোয়। পাশের ঘরটিও অংশুর জিম্মায়। তার পড়ার টেবিল, চেয়ার এবং নানা রঙিন ছবিতে ঘর ভর্তি। সবই খেলোয়াড়দের বড়-বড় ছবি। একটা দেওয়াল-জোড়া বাঘের ছবিও আছে।

জয়ন্তী অংশুর ঘরে ঢুকে অবাক! বিন্দু দেওয়ালের ছবিগুলো দেখছে। অংশু যে তার বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছে—সে-খেয়ালই যেন নেই।

জয়ন্তী কিছুটা বিরক্ত।

"এত কী দেখছিস! ওর পড়ার ঘরে কেউ ঢুকলে রাগ করে। তুই সকালে কী খাস?"

বিন্দু শুনছেই না। সে ছবিগুলো দেখতেই ব্যস্ত।

"এই, কী বলছি, শুনতে পাচ্ছিস না?"

"সকালে আমি কিছু খাই না।"

"ঠিক আছে, এখন থাকলে সকালে খেতে হবে। আমার বাড়িতে থাকলে, না খেলে চলবে না।"

"আমার যে কিছুই খেতে ইচ্ছে হয় না।"

এ-মেয়ের সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা কঠিন!

কী যেন মনে হল জয়ন্তীর! সে বড় ঘরের দরজা খুলে দুটো ফ্রক, দুটো প্যান্ট বের করে আনল।

"এ-দুটো তোকে দিলাম। পরে দ্যাখ, গায়ে হয় কি না। জামা-প্যান্ট ছেড়ে ধুয়ে দে। এ-দুটো পরবি।"

ফ্রক দুটো হাতে নিয়ে বিন্দু বলল, "আমার পরা কি ঠিক হবে! এত সুন্দর ফ্রক, কত যত্ন করে রেখেছ, আমাকে দেখে তোমার কি কিছু মনে হয়েছে?"

"আচ্ছা মেয়ে তো! তোর এত কথার জবাব দিতে পারব না। তোকে দেখে আমার কী মনে হবে! বসে থাকতে না পারিস, ফুলগাছগুলোতে জল দিবি। চল, দেখিয়ে দিচ্ছি সব।"

ফুলগাছে জল দিতে গিয়েও নানা ঝকমারি।

"ও মা, শুনছ?"

"কী হল?"

"বোগেনভেলিয়া গাছটা কোথায়! টবটা কোথায়! চাঁপা ফুলগাছটায় কত ফুল হত, তাও নেই।"

মগে জল দিচ্ছে, আর বিন্দু নেই নেই করছে।

জয়ন্তী কেমন ঘাবড়ে গেল। ধমক না দিয়ে পারল না, "শোন বিন্দু, জল দিচ্ছিস, জল দে। আমার বাড়িতে কী আছে, কী নেই, সেটা আমি বুঝব। আর কখনও যদি বলিস মণিকে ডেকে বিদায় করে দেব। বাড়িতে ঢুকেই আমার মাথা ধরিয়ে দিয়েছিস। বাবু তোর কথাবার্তা একদম পছন্দ করছে না।"

বিন্দু ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নয়। সে বলল, "তা খুলে বললেই পারতে। এতে মাথাধরার কী আছে বুঝি না! যখন তোমরা পছন্দ করছ না, বলব না!"

তারপর থেকে সুবোধ বালিকা হয়েই থাকল বিন্দু। সে জয়ন্তীর সব কাজে সাহায্য করে। বাবুকে চা দেয়, স্নানের জল গরম করে দেয়। সব ঘরদোর সাফ করে। ঝুল সাফ করে একেবারে বাড়িটাকে কিছুদিনের মধ্যেই ঝকঝকে করে তুলেছে। যখন কাজ থাকে না, একটা মাদুর বিছিয়ে বন্ধ ঘরটার দরজার সামনে শুয়ে থাকে।

এটাও যে শিরঃপীড়ার কারণ হবে বিন্দু বুঝতেই পারেনি। বাবু নিজেই ছুটে এসে একদিন বললেন, "বিন্দু, তুই কি শোয়ার আর জায়গা পাস না!"

"এখানে শুলে কী হয়?"

"না, শুবি না। সিঁড়ির ঘরে রাতে থাকিস, শুতে হয় সেখানে শুবি।" তারপর বাবু কেমন পাগলের মতো বকতে থাকলেন, "জয়ন্তী তুমি আর ওকে আশকারা দেবে না। কোন আক্কেলে ফ্রক দুটো ওকে দিলে, নতুন ফ্রক কিনে দিলে কী হত! আমি ওর দিকে তাকাতে পারি না।"

জয়ন্তী ওপরে উঠে দেখছে প্রিয়ব্রত সারা ঘর পায়চারি করছেন, আর বিন্দুকে বকছেন। বিন্দু কোনও কথা বলছে না, দরজায় হেলান দিয়ে নিঃশব্দে কাঁদছে। বিন্দুর এই অশ্রুপাত জয়ন্তীকে কেমন ক্ষিপ্ত করে তুলল। প্রিয়ব্রতকে ধিক্কার দিতে ছাড়ল না।

"বিন্দু কী করেছে, ওকে তুমি বকছ? সবসময় ওর দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াচ্ছ। পেছনে এত লাগলে হয়! বেচারা যাবে কোথায়? দিন-দিন কেমন মনমরা হয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ না!"

প্রিয়ব্রত খুবই কাতর চোখে একবার জোর করে যেন বিন্দুকে দেখলেন, তারপর নিঃশব্দে নীচে নেমে বসার ঘরে ঢুকে জানলায় দাঁড়ালেন। স্কুলবাড়িটার পাশ দিয়ে বড় রাস্তাটা দেখার চেষ্টা করলেন। দেখা যায় না, যেখান থেকে দেখা যায়, সেখানে তিনি আজ কত বছর হয়ে গেল কখনওই যান না। একবার মনের দুর্বলতা পরিহার করে জোর করে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াতেই মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন, তারপর থেকে ব্যালকনিটাই তাঁর আতঙ্কের কারণ হয়ে গেছে। কিছুটা যেন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন ওদিকটায় গেলে।

জয়ন্তী বলল, "বিন্দু, চোখের জল ফেলিস না মা। তুই কাঁদলে আমার বড় কষ্ট হয়। ওঠ তো, বসে থাকলি কেন?"

"মা, দরজাটা খুলে দাও না!"

"কেন?"

"ঘরটা সবসময় বন্ধ করে রাখলে হাওয়া ঢুকতে পারে না, বোঝো না? ঘরে পোকামাকড়ের উপদ্রব হয়। ঘরটার কী দোষ! আমি খুলে দেব।"

"চাবি পাবি কোথায়?"

"কেন, দেওয়ালে আছে, আমি তো জানি। ঘরটা সাফসোফ না করলে চলে?"

জয়ন্তীর মনে হল, 'সত্যি তো, কার ওপর অভিমানে এতকাল দরজা বন্ধ করে রেখেছে—ঘরটার কী দোষ! বিন্দু তো মিছে কথা বলেনি।'

বিন্দু ফের বলছে, "ঘর বন্ধ করে রাখলে বোঁটকা গন্ধ হয়, জানো! ঘরটায় যে থাকে, তারও কষ্ট হয়।"

"কে থাকে?"

"বাঃ রে! একটা বড় ছবি আছে না। টেনিস খেলে।" জয়ন্তীর কেমন ভয় ধরে গেল।

"বিন্দু, তুই জানলি কী করে, ঘরে ছবি আছে?"

"বাঃ রে, তোমাদের সব ঘরেই তো ছবি, না হয় ফোটো আছে। ওই তো ও-ঘরে দাদুর বড় একটা ছবি, ঘরটায় যে দাদু থাকতেন, ছবিটা দেখেই বুঝেছি। ও-ঘরটায় দিদার এই বড় ছবি, ঘরটায় বুড়ো বয়সে দিদা থাকতেন, ঠাকুরের সিংহাসন, কত দেবদেবীর ফোটো। তোমার বন্ধ ঘরটাতেও যে কারও ফোটো কিংবা ছবি থাকার কথা, বোকা লোকও বুঝতে পারে।"

জয়ন্তী দেখল, বিন্দুর সেই আগেকার স্বভাব আবার ফিরে আসছে।

সে বলল, "খুলি মা?"

"খোল। তবে তোর বাবু যেন দেখতে না পায়। বাবু যখন বাড়ি থাকবে না, তখন খুলে সাফসোফ যা করার করবি। মনে-থাকবে?"

বিন্দু ঘাড় কাত করে সায় দিল জয়ন্তীর কথায়।

সেদিন প্রিয়ব্রতবাবু অফিস থেকে ফিরে হতবাক! পাঁচিলের ওপর দিয়ে ফ্রক-পরা মেয়েটা ব্যালান্সের খেলা দেখাতে-দেখাতে হেঁটে যাচ্ছে। মাথায় কী হয়েছিল জানেন না, পাঁচিল থেকে পড়ে হাত-পা ভাঙবে এই আতঙ্কেও হতে পারে—তিনি ছুটতে থাকলেন।

"এই, এই, কী করছিস! আবার পাঁচিলে উঠে দৌড়ঝাঁপ করছিস? পড়েটড়ে হাত-পা ভাঙলে কী হবে! এতটুকু ভয়ডর নেই! তোকে কতবার বলেছি না, পাঁচিলে উঠে এভাবে লাফিয়ে-লাফিয়ে হাঁটবি না। ও জয়ন্তী, দ্যাখো তোমার মেয়ের কাণ্ড!"

এই কি—কাছে গিয়ে দেখছেন, পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বিন্দু। হা-হা করে হাসছে। বলছে, "আমি বিন্দু বাবু। দ্যাখো, দ্যাখো, আমি লাফিয়ে নেমে যেতে পারি।"

তারপর লাফ দিয়ে নেমে বিন্দু পাঁচিল টপকে সিঁড়িঘরের দিকে ছুটে গেল।

প্রিয়ব্রত দাঁড়িয়েই আছেন। তিনি ঘামছিলেন। সামান্য দূর থেকেও বুঝতে পারলেন না, বিন্দু পাঁচিলে হেঁটে বেড়াচ্ছে! এত ভুল দেখলেন! সেই একই প্রতিধ্বনি—'দ্যাখো, দ্যাখো আমি লাফিয়ে নেমে যেতে পারি।'

বাড়িতে ঢুকে বসার ঘরে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন প্রিয়ব্রত। তারপরই দেখলেন, "বাবু, চা তোমার," বলে বিন্দু তাঁর ঘরে ঢুকে গেল।

প্রিয়ব্রতর গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। তাঁর সত্যি চা-তেষ্টা পেয়েছে, না, তার চেয়েও আরও অন্য কিছু তাঁকে অধীর করে রেখেছে, মুখ দেখে বোঝা কঠিন।

তিনি কেমন কাতর গলায় বললেন, "বিন্দু, তুই আমাকে বাবু বলে ডাকিস না। কোনও কথাই শুনিস না, এ-কথাটা অন্তত আমার রাখ।"

বিন্দু মানবে কেন। বলল, "বাঃ রে, তুমি যে বাবু, বাবুকে বাবু বলব না তো কী বলব !"

প্রিয়ব্রত কেমন অসহায় বোধ করতে থাকলেন। একটা পুঁচকে মেয়ের কাছে জব্দ। বিন্দু তো জানে না, এই সংসারে 'বাবু' বলে একজনেরই ডাকার অধিকার ছিল। কোথাকার বিন্দু এসে বাবু বলে ডাকলে যে বড় গোলমালে পড়ে যান তিনি। বিন্দুর চোখ দুটোও যে বড় আকুল হয়ে দেখে তাঁকে ! প্রিয়ব্রত ভেবে পান না, বিন্দুকে নিয়ে তিনি কী করবেন !

বিন্দু আবার লাফিয়ে-লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙছে। বাবু তাকে আর কিছু বলেন না। এবং তাকে দেখলেই কেমন এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। বিন্দুর তখন বড় অভিমান হয়। সে লুকিয়ে-লুকিয়ে কাঁদে।

অবশ্য বিন্দুর মান-অভিমান খুবই ক্ষণিকের। বাবু না থাকলে বন্ধ ঘরের দরজা খুলে সে সহজেই ভেতরে ঢুকে যেতে পারে। ঘরটায় ঢুকলেই তার সব দুঃখ যেন নিমেষে মুছে যায়। আগের মতো ঘরটা আর নোংরা নেই। সে কাচের আলমারি কাপড়ে মুছে ফেলতেই দেখেছে থরে-থরে সাজানো সব খেলনা। বারবি, ড্রামবাদক, দুটো পুসিক্যাট, রেলগাড়ি, খরগোশের ঢাউস চোখ—সে দ্যাখে আর অবাক হয়ে যায়। সে জানলা খুলে দেয়। র‍্যাকেট হাতে বিশাল এক মেয়ের ছবি—যেন তার কতকালের চেনা। দু-এক জায়গায় স্টিকার খুলে পড়েছে। জয়ন্তীকে বলে স্টিকার আনিয়ে ছবিটাকে ফের খাড়া করে দিয়েছে।

সে এই ঘরের সবকিছুই গোছগাছ করে রাখে। সারাদিন কাজের পর সে টেবিলে ভাঁজ করে রাখে সব বই-খাতা। রঙিন সব ড্রইংবুক, রঙের পেনসিল সবই এলোমেলো হয়ে পড়ে ছিল—সে সুন্দর করে সব পাশাপাশি রেখে দিয়েছে।

জয়ন্তী মাঝে-মাঝেই এসে তাড়া দেয়, "কী হল রে তোর ? কী করছিস ! ঘর ঝাঁট দিতে, মুছতে এত সময় লাগে !"

সে উত্তর দেয়, "যাই মা। এই হয়ে গেল !"

জয়ন্তীর তখন এক কথা, "তাড়াতাড়ি কর। তোর বাবু কখন এসে যাবে !" ঘরটা খোলা থাকলে যে তার বাবু ভীষণ অস্বস্তির মধ্যে পড়ে যান, বিন্দু জানবে কী করে ! সে নিজেও ঘরটায় ঢুকে খুব একটা স্বস্তি পায় না। চোখ জলে ভার হয়ে আসে, ঠোঁট বেঁকে যায়— কান্নারও উপায় নেই, সে মুখে আঁচল-চাপা দিয়ে কোনওরকমে যেন ছুটে পালাতে পারলে বাঁচে ! দিন যত যাচ্ছে, জয়ন্তী ফাঁপরে পড়ে যাচ্ছে।

বিন্দু সবসময় তাকে লেপটে থাকতে চায়। শুধু বন্ধ ঘরটায় ঢুকে গেলে বিন্দুর আর বোধ হয় তার কথা মনে থাকে না। ডেকে ঘর বন্ধ করে তবে নীচে নামতে হয়। সিঁড়ি ধরে নামার সময়ই একদিন কেন যে বলল, "আচ্ছা মা, পাখার এমন সুন্দর সাদা রং কেন কালো করে দিলে !"

"সাদা রং ছিল কে বলল তোকে ?"

"বাঃ রে, পাখার রং সাদা হয় না বলছ !"

"কালো রঙেরও হয়।"

"সাদা রঙের পাখাগুলো কি বিক্রি করে দিয়েছ ?"

আর তখনই, যা হয়, জয়ন্তীর মাথা খারাপ হয়ে যায়—"তোকে কে বলেছে পাখার রং সাদাই ছিল। তুই এসব কথা কার কাছে শুনেছিস ? মণি তোকে কিছু বলেছে ? মণি কি তোকে সব খবর দেয় ? মণি বিশ-বাইশ বছর ধরে আছে, সব জানে। আর শুনে-শুনে তুই আমার কান ঝালাপালা করে দিস।"

"না মা, মণিমাসি আমাকে কিছু বলেনি। তুমি আবার ওকে গালমন্দ কোরো না।"

"তবে জানিস কী করে ?"

"আমার যে মনে হয় !"

"তোর মনে-হওয়া বের করছি। কাজকাম না থাকলে তোর মাথায় যত সব দুষ্টুবুদ্ধি গজায় ! বই কিনে আনব, কাল থেকে তুই পড়বি আমার কাছে।"

বিন্দুর মুখ পড়ার নামে বড় বিমর্ষ হয়ে গেল। তারপরই এমন একটা কথা বলল যে, জয়ন্তী বোধ হয় মাথা ঘুরে পড়েই যেত !

"দাদু-দিদার ঘর খালি। এত ঘর খালি রাখা কি ঠিক ? পর-পর সব মরে গেল। তোমরা বড় একা হয়ে গেছ, না মা !"

চিৎকার করে উঠল জয়ন্তী, "কেন তুই এ-বাড়িতে কাজে ঢুকলি! ছাড়াতেও পারছি না, তোকে সহ্যও করতে পারছি না। আবার বলছি, খবরদার, কখনও এসব কথা বাবুর সামনে বলবি না। বাবু তোকে তবে মেরেই ফেলবে।"

"মেরে ফেললে কী হবে, দেখবে তখন যে, ঘাসফুল হয়ে মাঠে ফুটে থাকব আমি। তোমরা তখন আর আমাকে চিনতে পারবে না।"

জয়ন্তী পাগলের মতো সিঁড়ি ধরে ছুটতে-ছুটতে নামছে। আর [illegible] আর্তনাদের মতো শোনাচ্ছে, "ওগো শুনছ, বিন্দু যে বলছে..."

"কী বলছে ?"

"ওই শুভাকে মারতে গেলে বক[illegible] না ! মারলে কী হবে, দেখবে তখন মাঠে ঘাসফুল হয়ে ফুটে থাকব। আমাকে তোমরা চিনতেই পারবে না !"

প্রিয়ব্রত থরথর করে কাঁপছেন—'বিন্দু, বিন্দু, তুই কোথায় পালাচ্ছিস। বিন্দু, বিন্দু, শুভার পছন্দ-অপছন্দের কথা তুই এত জানলি কী করে !' বিন্দু, বিন্দু—এক গোলাকার বৃত্তের মধ্যে সেই মুখ, শুভা হাসছে, দাদু তুমি ব্যালকনিতে, হাত তুলে দেবে। স্কুলবাস থেকে নেমে ফার্স্ট হলে আমি[illegible] হাত তুলে দেব। সেই বৃদ্ধ মানুষটির[illegible] মুখ ভেসে উঠল গোলাকার বৃত্তে। নাতনির অপেক্ষায় বসে আছেন—রোজ[illegible] বসে থাকেন স্কুল থেকে ফেরার সম[illegible] হলে—সেদিন তাদের দু'জনে কী কথা[illegible] হয়েছিল কেউ জানে না—আয়াটির মুখ[illegible] ভেসে উঠল—বাস থেকে নেমেই শুভা হাত তুলে দিয়েছিল, কিন্তু অধীর হ[illegible] পড়ছিল দাদুকে কতক্ষণে খবরটা দেবে[illegible] তার হাত ছাড়িয়ে রাস্তা পার হয়ে ছু[illegible] আসছিল—আর সেই গোলাকার বৃ[illegible] আবার এক ম্যাটাডোর ঈগলপাখির মতো উড়ে আসছিল, থাবা মেরে শুভাকে পলকে ঠোঁটে তুলে হাওয়া হয়ে গেল। গোলাকার বৃত্তটি চোখের ওপর থেকে মুছে যেতেই প্রিয়ব্রত মাথা নিচু ক[illegible] কোনওরকমে বসে পড়লেন। তিনি কিছুই আর দেখতে পাচ্ছেন না।

প্রিয়ব্রত কিছুটা আরোগ্যলাভের পর[illegible] বিন্দুর খোঁজ নিলেন। জয়ন্তী বলল, "[illegible] তার মাসির বাড়ি চলে গেছে। এখানে আর কাজ করবে না।"

প্রিয়ব্রত আরও সুস্থ হয়ে একদিন নিজেই চলে গেলেন বিন্দুর মাসির বাড়ি।

কোথায় বিন্দু ! নেই। কোথায় বিন্দু ! দেশে গেছে। কোথায় বিন্দু [illegible] বিন্দুর কোনও আর খোঁজ নেই।

মণির সবসময় আগ বাড়িয়ে কথা বলার স্বভাব। বলল, "কী-ই বা বল[illegible] ওই যেদিন শুভাদি চাপা পড়ল, সেদিন রাতেই তো মেয়েটা জন্মাল।"

জয়ন্তী তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ ক[illegible] বলল, "চুপ, চুপ। আর একটি[illegible] আজেবাজে কথা না। মানুষটাকে [illegible] তোরা সবাই মিলে মেরে ফেলবি ?"

ছবি : নির্মলেন্দু মণ্ডল